আনন্দবাজার পত্রিকা

মসজিদে জল নেন হিন্দু মেয়েরাও

মসজিদ পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে আসে বহু পড়ুয়া। ইফতারে ফল-মিষ্টি সরবরাহ করেন হিন্দু ব্যবসায়ী।

সাবির আহমেদ

২ জুন, ২০১৯,

কোচবিহার রাজবাড়ির অদূরে শতাব্দীপ্রাচীন মসজিদটি আজও ‘নূতন মসজিদ’ নামে খ্যাত। শহরের মুসলমান প্রজাদের জন্য মসজিদ তৈরিতে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এক বিঘা ছয় কাঠা তের ধুর নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। সেখানেই ১৮৮৫ সালে গড়ে ওঠে ‘নূতন মসজিদ’। ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে জমজমাট এই জনপদে দূরদূরান্ত থেকে মানুষের আনাগোনা লেগে থাকত, বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে ‘সওদাগর’ উপাধিধারী মুসলমান ব্যবসায়ীদের জুতা, ছাতা ও পোশাকের কারবারের রমরমা ছিল। স্থানীয় মুসলমানরাও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবসা করতেন। শহরে মুসলমানদের একটি প্রার্থনাস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে ব্যবসায়ী শেখ ইউসুফ সওদাগরের নেতৃত্বে কয়েক জন বিশিষ্ট মুসলমান মসজিদের জন্য এক খণ্ড নিষ্কর জমির আবেদন করলে, মহারাজ তা অবিলম্বে মঞ্জুর করেন। কাছেই সিলভার জুবিলি রোডে ‘বাতাসা মসজিদ’ নামে একটা মসজিদ আগে থেকেই ছিল, তাই স্থানীয় মানুষের মুখে এই মসজিদের নাম হল ‘নতুন মসজিদ’।

কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্টের বড়বাবু জয়ন্ত চক্রবর্তী জানালেন, মহারাজের আমলে সাহায্যপ্রাপ্ত নতুন মসজিদ-সহ পিঁয়াজবাড়ি মসজিদ, ওল্ড মিলিটারি মসজিদ, কাঁসারপাড়া মসজিদ, পিলখানা মসজিদ, ছাত-গুড়িয়ার মতো প্রাচীন মসজিদগুলো আজও দেবোত্তর ট্রাস্ট থেকে অনুদান পায়। এই জেলায় ‘তোরসা’ পীরের ধাম পরিচালনার আর্থিক দায়ভার বহন করতেন কোচবিহারের মহারাজারা। জেলায় সবচেয়ে বড় মহরমের উদ্‌যাপন হয় এই ধামেই, ৩৮ ফুট তাজিয়ার খরচ-সহ অনুষ্ঠানের সব খরচ বহন করে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট। অন্য দিকে, কোচবিহার শহরের ২০৬ বছরের প্রাচীন রাসমেলার রাসচক্র বংশপরম্পরায় তৈরি করে আসছে এক মুসলমান পরিবার। বর্তমান প্রজন্মের আলতাফ মিয়া জানালেন, ‘‘লক্ষ্মীপূর্ণিমা থেকে শুরু করি, আর রাসপূর্ণিমাতে শেষ হয়। এই এক মাস আমি নিরামিষ খাই।’’

নতুন মসজিদ তৈরির নিষ্কর জমিদানের হুকুমনামায় মহারাজ কেবল একটা শর্ত জুড়েছিলেন— ‘এই ভূমির উপর কোনরূপ জীব হত্যা হইতে পারবে না’। সেই নির্দেশের পর একশো বছর পেরিয়েছে, রাজাদের দিন শেষ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মসজিদ পরিচালন কমিটির সঙ্গে যুক্ত হামিদ হোসেন জানালেন, “মহারাজার নির্দেশ আজও মানা হয়। চত্বরে মুরগি পর্যন্তও জবেহ হয় না।’’ মসজিদ চত্বরে পশুহত্যা না করার এই পরম্পরা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক স্থানীয় বাসিন্দা মন্তব্য করলেন, “ভালবেসে কী না হতে পারে!’’

বিশ শতকের গোড়ার দিকে স্থানীয় মুসলমানরা মসজিদ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২৩ সালে ‘নতুন মসজিদ’-এর নবরূপের উদ্বোধন করেন হায়দরাবাদ নবাব পরিবারের সদস্য ও রানির সেক্রেটারি মেজর

খসরু জং। সব ধর্মের আটশো-ন'শো মানুষের সমাগমে স্বাগত ভাষণ দেন মসজিদের মৌলবি আনসার উদ্দিন। রাজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী আনসার উদ্দিন তাঁর মায়ের স্মৃতিতে ১৯২০ সালে মসজিদের মূল প্রবেশদ্বারের কাছে পানীয় জলের জন্য একটা পাকা কুয়ো খনন করান। মসজিদের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ মানুষদের স্মৃতিতে আজও হিন্দু-মুসলিম মহিলাদের একযোগে মসজিদ চত্বরে জল আনতে আসার ছবিটা স্পষ্ট। কালের নিয়মেই কুয়োর বদলে টাইম-কল বসেছে, তবে মসজিদ থেকে হিন্দু মহিলারা আজও জল নিতে আসেন। বর্তমানে পানীয় জলের নানান ব্যবস্থা আছে নতুন মসজিদ চত্বর এলাকায়, কিন্তু কিছু হিন্দু পরিবার বিশ্বাসের বশে পানীয় জল হিসাবে মসজিদের পানিই ব্যবহার করেন আজও।

নতুন মসজিদ পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শয়ে-শয়ে ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ পেয়ে এখন কর্মরত। কম্পিউটার শিখতে এসে সুমনার বন্ধুত্ব হয় রুবিনার সঙ্গে। ''এখানে এসেই প্রতিবেশীকে ভাল করে চিনলাম। মুসলমানদের সম্পর্কে ভুল ধারণাও ভেঙে গেছে,'' জানালেন সুমনা।

চিকিৎসার প্রয়োজনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেয়েরা কোচবিহার শহরে আসেন। মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগার না থাকায় তাঁদের কষ্ট হত। মসজিদ কমিটি তাই মসজিদ চত্বরেই মেয়েদের শৌচালয় ও বিশ্রাম-ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিষেবা সব ধর্মের মেয়েদের জন্যই, বিনামূল্যে। মসজিদে মহিলাদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে।

সরকারি সাহায্যে এখানে গড়ে উঠেছে ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র। পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে কাজের খোঁজে যান স্থানীয় বহু মানুষ, সেখানে আরবি ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন হয়। তা মাথায় রেখে কয়েক বছর ধরে চলছে 'ফাংশনাল আরবি' কোর্স। এই ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রের অধিকাংশ ছাত্রই হিন্দু!

মহারাজার সময় থেকেই রমজান মাসে ইফতারে সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে 'দোস্তি কি ইফতার'-এর পরম্পরা আজও বহমান। রমজানের মাসের সাতাশ তারিখে বিশেষ ইফতারে মিষ্টি সরবরাহ করেন স্থানীয় এক মিষ্টির দোকানের মালিক বাচ্চু ঘোষ, আর খেজুর ও অন্যান্য ফল-সহ ইফতারের সামগ্রী সরবরাহ করেন স্থানীয় দোকানদার পরিমল দত্ত। দুজনেই বললেন, একসঙ্গে বসবাস করলে এটাই তো স্বাভাবিক। অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মসজিদের ঝাঁ-চকচকে ১৫০ আসন-বিশিষ্ট সভাকক্ষে সারা বছরই হয় নানান আলোচনা অনুষ্ঠান। মসজিদের লাইব্রেরিতে ধর্মীয় বইয়ের পাশাপাশি আছে বাংলা-ইংরাজি-উর্দু সাহিত্যের সম্ভার, পাঠ্যপুস্তক, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল। ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক কারণে অনেক কিছু করা যায় না, জানালেন মসজিদ পরিচালন কমিটির সদস্য হাজি ইন্তেজার আহমেদ। বছরখানেক আগে এক সংস্থার উদ্যোগে কেরিয়ার কাউন্সেলিং শুরু হয়েছিল। সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই উদ্যোগ থেমে গিয়েছে।

এই বিশাল কর্মকাণ্ডের রসদ জোগাড় হয় কী ভাবে? সরকারি অনুদান তো যৎসামান্য। জানা গেল, মসজিদের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের জন্য প্রথম থেকেই বাণিজ্যিক কিছু দোকানঘর তৈরি হয়েছিল। সেগুলি লিজে দেওয়া হয়। বর্তমানে মোট ৪৮ জন ভাড়াটিয়ার মধ্যে মাত্র ৮ জন মুসলমান। ১৯৯৭ সালে নতুন মসজিদ কমিটি দোকানদারদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নতুন ভাড়া স্থির করে। সেই ভাড়ার টাকাতেই চলে মসজিদের নানা কর্মকাণ্ড।

মুসলমান সমাজের পিছিয়ে থাকা নিয়ে হাপিত্যেশ করতে দেখা যায় বহু মানুষকে। সমাজে নাগরিকদের মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখানোয় মসজিদের কি কোনও ভূমিকা আছে? শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করতে পারে কি? চারপাশে সে রকম উদাহরণ কম নয়। চেন্নাইতে মসজিদের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসাবে। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে এক জন আইএএস আধিকারিক হয়েছেন। রাজনীতি যখন ধর্মে ধর্মে বিভেদ ঘটাচ্ছে, কোচবিহারের নতুন মসজিদ সেখানে সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নিদর্শন।